আল জাসিয়াহ

৪৫

নামকরণ

২৮ আয়াতের وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'জাসিয়াহ' শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়–কাল কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় এটি সূরা 'দুখান' নাযিল হওয়ার অল্প দিন পরই নাযিল হয়েছে। এ দুটি সূরার বিষয়বস্তুতে এতটা সাদৃশ্য বর্তমান যে সূরা দুটিকে যমজ বা যুগ্ম বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপাত্তির জবাব দেয়া এবং কুরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যে নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সতর্ক করা।

তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের প্রতি ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে, যেদিকেই চোখ মেলে তাকাও না কেন তোমরা যে তাওহীদ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো প্রতিটি বস্তু তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। নানা রকমের এসব জীব–জন্তু, এই রাতদিন, এই বৃষ্টিপাত এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন উদ্ভিদ রাজি, এই বাতাস এবং মানুষের নিজের জন্ম এর সবগুলো জিনিসকে কোন ব্যক্তি যদি চোখ মেলে দেখে এবং কোন প্রকার গোঁড়ামি বা অন্ধ আবেগ ছাড়া নিজের বিবেক–বুদ্ধিকে সরাসরি কাজে লাগিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে এসব নিদর্শন তার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট যে এই বিশ্ব জাহান খোদাহীন নয় বা এখানে বহু খোদায়ী চলছে না, বরং এক আল্লাহ এটি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একাই এর ব্যবস্থাপক ও শাসক। তবে যে ব্যক্তি মানবে না বলে শপথ করেছে কিংবা সন্দেহ–সংশয়ের মধ্যে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার কথা ভিন্ন। দুনিয়ার কোন জায়গা থেকেই সে ঈমান ও ইয়াকীনের সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানুষ যত জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করছে এবং এই বিশ্ব জাহানে যে সীমাসংখ্যাহীন বস্তু ও শক্তি তার স্বার্থের সেবা করছে

তা আপনা আপনি কোথাও থেকে আসেনি বা দেব–দেবীরাও তা সরবরাহ করেনি, বরং এক আল্লাহই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাকে এসব দান করেছেন এবং এসবকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। কেউ যদি সঠিকভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক–বুদ্ধিই বলে দেব, সেই আল্লাহই মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী মানুষ তাঁর শোকর গোজারী করবে এটা তাঁর প্রাপ্য।

এরপর মক্কার কাফেররা হঠকারিতা, অহংকার, ঠাট্টা–বিদ্রূপ এবং কুফরকে আঁকড়ে ধরে থেকে কুরআনের দাওয়াতের যে বিরোধিতা করছিলো। সে জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ কুরআন সেই নিয়ামত নিয়ে এসেছে যা ইতিপূর্বে বনী–ইসরাঈলদের দেয়া হয়েছিলো যার কল্যাণে বনী ইসরাঈলরা গোটা বিশ্বের সমস্ত জাতির ওপর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো। কিন্তু তারা এই নিয়ামতের অমর্যাদা করেছে এবং দীনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করে তা হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন তা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা এমন একটি হিদায়াতনামা যা মানুষকে দীনের পরিষ্কার রাজপথ দেখিয়ে দেয়। নিজেদের অজ্ঞতা ও বোকামির কারণে যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করবে। আর আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল তারাই যারা এর আনুগত্য করে তাকওয়ার নীতি ও আচরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বলা হয়েছে, এসব লোক আল্লাহকে ভয় করে না। এরা তোমাদের সাথে যে অশোভন আচরণ করছে তা উপেক্ষা করো এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করলে আল্লাহ নিজেই এদের সাথে বুঝাপড়া করবেন এবং তোমাদের এই ধৈর্যের প্রতিদান দিবেন।

তারপর আখেরাত বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত কাফেরদের জাহেলী ধ্যান–ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। কাফেররা বলতো ঃ এই দুনিয়ার জীবনই সব। এরপর আর কোন জীবন নেই। যুগের বিবর্তনে আমরা ঠিক তেমনি মরে যাব যেমন একটি ঘড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে রূহের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না যে, তা কব্‌জ করা হবে এবং পুনরায় কোন এক সময় এনে দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। তোমরা যদি এ ধরনের দাবী করো তাহলে আমাদের মৃত বাপ–দাদাদের জীবিত করে দেখাও। এর জবাবে আল্লাহ একের পর এক কয়েকটি যুক্তি পেশ করেছেন ঃ

এক ঃ কোন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তোমরা একথা বলছো না, বরং শুধু ধারণার ভিত্তিতে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ। সত্যিই কি তোমাদের জানা আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই এবং রূহ কব্‌জ করা হয় না, বরং ধ্বংস হয়ে যায়?

দুই ঃ তোমাদের এই দাবীর ভিত্তি বড় জোর এই যে, তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে দেখোনি। এতটুকু বিষয়ই কি এতবড় দাবী করার জন্য যথেষ্ট যে মৃতরা আর কখনো জীবিত হবে না? তোমাদের অভিজ্ঞতায় ও পর্যবেক্ষণে কোন জিনিস ধরা না পড়ার অর্থ কি এই যে, তোমরা তার অস্তিত্বহীন হওয়ার জ্ঞান লাভ করেছো?

তিন ঃ এ কথা সরাসরি বিবেক–বুদ্ধি ও ইনসাফের পরিপন্থী যে ভাল ও মন্দ, অনুগত ও অবাধ্য এবং জালেম ও মজলুম সবাইকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ভুক্ত করে দেয়া হবে। কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেখা দেবে না। কোন মজলুমের আর্তনাদ শোনা হবে না কিংবা কোন জালেম তার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না। বরং সবাই একই পরিণাম ভোগ করবে। আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্ব জাহান সম্পর্কে যে এই ধারণা পোষণ করে সে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। জালেম ও দুষ্কর্মশীল লোকদের এ ধারণা পোষণ করার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের কাজ–কর্মের মন্দ ফলাফল দেখতে চায় না। কিন্তু আল্লাহর এই সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোন অনিয়মের রাজত্ব নয়। এটি একটি ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে সৎ ও অসৎকে এক পর্যায়ভুক্ত করে দেয়ার মত জুলুম কখনো হবে না।

চার ঃ আখেরাত অস্বীকৃতির এই আকীদা নৈতিকতার জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। এই আকীদা তারাই গ্রহণ করে যারা প্রবৃত্তির দাস হয়ে আছে। তারা এ আকীদা গ্রহণ করে এ জন্য, যাতে প্রবৃত্তির দাসত্ব করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কাজেই তারা যখন এ আকীদা গ্রহণ করে তখন তা তাদেরকে চরমতম গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। এমনকি তাদের নৈতিক অনুভূতি একেবারেই মরে যায় এবং হিদায়াত লাভের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছেন, যেভাবে তোমরা নিজে নিজেই জীবন লাভ করোনি, আমি জীবন দিয়েছি বলে জীবন লাভ করেছো, তেমনি নিজে নিজেই মরে যাবে না, বরং আমি মৃত্যু দেই বলে মারা যাও এবং এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তোমাদের সবাইকে যুগপৎ একত্র করা হবে। আজ যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তোমরা একথা না মানতে চাও তাহলে মেনো না। কিন্তু সে সময়টি যখন আসবে তখন নিজের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির আছো এবং কোন প্রকার কমবেশী ছাড়াই তোমাদের পুরো আমলনামা প্রস্তুত আছে, যা তোমাদের প্রতিটি কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে সময় তোমরা জানতে পারবে আখেরাতের আকীদার এই অস্বীকৃতি এবং এ নিয়ে যে ঠাট্টা–বিদ্রূপ তোমরা করছো এর কত চড়া মূল্য তোমাদের দিতে হচ্ছে।

حٰمٓ (১) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (২) اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (৩) وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (৪) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (৫) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (৬)

হা–মীম। এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[১]

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মু'মিনদের জন্য আসমান ও যমীনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।[২] *তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এবং যেসব জীব–জন্তুকে আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার মধ্যে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের জন্য।*[৩] *তাছাড়া রাত ও দিনের পার্থক্য ও ভিন্নতার মধ্যে,*[৪] *আল্লাহ আসমান থেকে যে রিযিক*[৫] *নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে যে জীবিত করে তোলেন তার মধ্যে*[৬] *এবং বায়ু প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে*[৭] *অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধি–বিবেচনাকে কাজে লাগায়। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমাদের সামনে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাদি ছাড়া এমন আর কি আছে যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?*[৮]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। এতে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এর একটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

নিজের রচনা নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব নাযিল করছেন আল্লাহ, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। তাঁর মহাপরাক্রমশালী হওয়ার দাবী হলো, মানুষ যেন তাঁর আদেশের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস না দেখায়। কারণ অবাধ্য হয়ে সে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। তাঁর মহাজ্ঞানী হওয়ার দাবী হলো মানুষ পূর্ণ মানসিক প্রশান্তিসহ স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে তাঁর হিদায়াত ও আদেশ–নিষেধ পালন করবে। কারণ, তাঁর শিক্ষা ভ্রান্ত, অসংগত ও ক্ষতিকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

২. ভূমিকার পর মূল বক্তব্য এভাবে শুরু করায় স্পষ্ট বুঝা যায় এর পটভূমিতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার লোকদের পেশকৃত আপত্তিসমূহ। তারা বলতো ঃ আজ পর্যন্ত যেসব সম্মানিত সত্তার আস্তানার সাথে আমাদের ভক্তি–শ্রদ্ধা জড়িত তারা সবাই তুচ্ছ। নগণ্য আর সার্বভৌম কর্তৃত্ব শুধু এক মাত্র আল্লাহর, এক ব্যক্তির কথায় এত বড় একটা জিনিস আমরা কি করে মেনে নেই। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যে সত্যটি মানার জন্য তোমাদের আহবান জানানো হচ্ছে সারা বিশ্ব জাহান তার সত্যতার নিদর্শনে ভরা। চোখ মেলে দেখো। তোমাদের ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র শুধু নিদর্শনই ছড়িয়ে আছে। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে, গোটা এই বিশ্ব জাহান একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনি একাই এর মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক। আসমান ও যমীনে কোন জিনিসের নিদর্শন আছে তা বলার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তখন বিবাদের মূল বিষয় ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহর সাথে অন্য সব খোদা এবং উপাস্যদের মানার জন্য জিদ ধরেছিলো। পক্ষান্তরে কুরআনের দাওয়াত ছিল এই যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। তাই নিদর্শনসমূহ অর্থ যে তাওহীদের সত্যতা ও শিরক বাতিল হওয়ার নিদর্শন একথা বলা না হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি থেকেই তা প্রকাশ পাচ্ছিলো।

তাছাড়া এই যে বলা হয়েছে, "এসব হচ্ছে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন" এর অর্থ, যদিও এগুলো সমস্ত মানুষের জন্যই নিদর্শন, কিন্তু এসব দেখে সঠিক সিদ্ধান্ত কেবল তারাই নিতে পারে যারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত। গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকা মানুষ, যারা পশুর ন্যায় বেঁচে থাকে এবং একগুঁয়ে ও জেদী লোক, যারা না মানার সংকল্প করে বসেছে তাদের জন্য এগুলো নিদর্শন হওয়া না হওয়া সমান কথা। বাগানের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য তো চক্ষুস্মানদের জন্য। অন্ধরা কোন চাকচিক্য ও সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না। তাদের জন্য বাগানের অস্তিত্বই অর্থহীন।

৩. অর্থাৎ যারা না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিংবা যারা নিজেদের জন্য সন্দেহের গোলক ধাঁধায় হাতড়িয়ে বেড়ানো পসন্দ করেছে তাদের ব্যাপার তো ভিন্ন। কিন্তু যাদের মনের দরজা বন্ধ হয়নি তারা যখন নিজের জন্মের প্রতি নিজের অস্তিত্বের গঠন আকৃতির প্রতি এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা নানা রকম জীব–জন্তুর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে তখন এমন অসংখ্য আলামত দেখতে পাবে যা দেখার পর এ সন্দেহ পোষণের সামান্যতম অবকাশও থাকবে না যে, এসব কিছু হয়তো কোন আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তার

সৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়তো একাধিক খোদার হাত আছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ২৫ থেকে ২৭; আন নাহল, টীকা ৭ থেকে ৯; আল হাজ্জ, টীকা ৫ থেকে ৯; আল মুমিনূন টীকা ১২ ও ১৩; আল ফুরকান টীকা ৬৯; আশ শুআরা, টীকা ৫৭ ও ৫৮; আন নামল, টীকা ৮০; আর রূম, টীকা ২৫ থেকে ৩২ ও ৭৯; আস সাজদা, টীকা ১৪ থেকে ১৮; ইয়াসীন, আয়াত ৭১ থেকে ৭৩; আয যুমার আয়াত ৬ এবং আল মু'মিন, টীকা ৯৭, ৯৮ ও ১১০)।

৪. রাত ও দিনের এই পার্থক্য ও ভিন্নতা এদিক দিয়েও নিদর্শন যে, দুটিই পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটার পর আরেকটা আসে। আবার এদিক দিয়েও নিদর্শন যে একটি আলো আরেকটি অন্ধকার। তাছাড়া তার নিদর্শন হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দিন ক্রমান্বয়ে ছোট এবং রাত বড় হতে থাকে এবং এক সময়ে দুটি এক সমান হয়ে যায়। তারপর আবার ক্রমান্বয়ে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে। তারপর এক সময় দিন রাত আবার সমান হয়ে যায়। রাত ও দিনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এই যে, পার্থক্য ও ভিন্নতা দেখা যায় তার সাথে বিরাট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জড়িত। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্টরূপে একথাই প্রমাণ করে যে, সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব বস্তুর স্রষ্টা মাত্র একজন এবং তিনি এক মহাশক্তির সত্তা। তিনিই এ দুটি গ্রহকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোন অন্ধ, বধির ও অযৌক্তিক ক্ষমতা নয়, বরং এমন জ্ঞানগর্ভ ক্ষমতা যা এই অনড় হিসাব-নিকাশ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে তার সৃষ্ট উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষের মত অসংখ্য প্রজাতির জীবনসত্তার জীবন ধারণের উপযোগী করে দিয়েছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৫; আন নামল; টীকা-১০৪; আল কাসাস, টীকা ৯২; লোকমান, আয়াত ২৯; টীকা ৫০ ইয়াসীন, আয়াত ৩৭; টীকা ৩২)।

৫. এখানে রিযিক অর্থ যে বৃষ্টি তা পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন, টীকা ১৭; আল ফুরকান, টীকা ৬২ থেকে ৬৫; আশ শুআরা, টীকা ৫, আন নামল, টীকা ৭৩ ও ৭৪; আর রূম, টীকা ৩৫ ও ৭৩ এবং ইয়াসীন, টীকা ২৬ থেকে ৩১।

৭. বায়ু প্রবাহ অর্থ বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্নভাবে হাওয়া প্রবাহিত হওয়া, যার কারণে ঋতুর পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেখার বিষয় শুধু এটাই নয় যে, পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগে একটি বিশাল বায়ু স্তর আছে যার মধ্যে এমন সব উপাদান বিদ্যমান যা প্রাণীকূলের শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজন এবং বাতাসের এই আবরণ পৃথিবীবাসীদের বহু আসমানী বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বরং এর সাথে এটাও দেখার বিষয় যে, এ বাতাস উর্ধ বায়ুমণ্ডলে শুধু বিদ্যমান নয়, মাঝে মধ্যে তা বিভিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। কখনো মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, কখনো তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার ঝড় তুফানের রূপ ধারণ করে। কখনো শুষ্ক হাওয়া প্রবাহিত হয়, কখনো আর্দ্র হাওয়া প্রবাহিত হয়। কখনো বৃষ্টিবাহী হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং কখনো আবার তা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার হাওয়া প্রবাহিত হয়। নানা ধরনের এসব বাতাস আপনা থেকেই এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় না। এরও একটা নিয়ম-কানুন ও শৃংখলা আছে, যা সাক্ষ্য দেয়, এ ব্যবস্থা পূর্ণ মাত্রায় যুক্তিনির্ভর এবং এর দ্বারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূরণ

وَيۡلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍ ۙ﴿٧﴾ يَّسۡمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتۡلٰی عَلَيۡهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرًا كَاَنۡ لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿٨﴾ وَ اِذَا عَلِمَ مِنۡ اٰيٰتِنَا شَيۡـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ﴿٩﴾ مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغۡنِیۡ عَنۡهُمۡ مَّا كَسَبُوۡا شَيۡـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِيَآءَ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ﴿١٠﴾ هٰذَا هُدًی ۚ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِيۡمٌ ﴿١١﴾

ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তির জন্য যার সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় এবং সে তা শোনে তারপর পুরো অহংকার নিয়ে কুফরীকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যেন সে ঐগুলো শোনেইনি।[৯] এ রকম লোককে কষ্টদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও। যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোন কথা জানতে পারে তখন তা নিয়ে উপহাস ও বিদ্রূপ করে।[১০] এরূপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম।[১১] তারা পৃথিবীতে যা কিছু অর্জন করেছে তার কোন জিনিসই তাদের কাজে আসবে না আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না।[১২] তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। এই কুরআন পুরাপুরি হেদায়াতের কিতাব। সেই লোকদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে। যারা নিজেদের রব–এর আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

হচ্ছে। তাছাড়া পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থা অনুসারে শীত ও গ্রীষ্মের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাছাড়াও ঋতু পরিবর্তন ও বৃষ্টি বন্টনের সাথেও এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর সবগুলো জিনিসই ডেকে ডেকে বলছে, কোন অন্ধ প্রকৃতি আকস্মিকভাবে এর ব্যবস্থা করে দেয়নি। কিংবা সূর্য ও পৃথিবী হাওয়া ও পানি এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জন্য আলাদা আলাদা কোন ব্যবস্থাপক নেই। বরং নিশ্চিতরূপে এক মাত্র আল্লাহই এসবের স্রষ্টা এবং এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর জ্ঞান ও কৌশল এ ব্যবস্থা করেছে। তাঁর অসীম ক্ষমতাবলেই এ ব্যবস্থা পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও তাঁর "ওয়াহদানিয়াত" বা একত্বের স্বপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পেশকৃত এসব যুক্তি–প্রমাণ সামনে আসার পরও যখন এসব লোক ঈমান গ্রহণ করছে না

তখন এমন কি জিনিস আর আসতে পারে যার কারণে ঈমানের সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহর কালামই তো সেই চূড়ান্ত বস্তু যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। আর একটি অদেখা সত্য সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব তা এই পবিত্র কালামে পেশ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করতেই বদ্ধপরিকর থাকে তাহলে করতে থাকুক। তার অস্বীকৃতির ফলে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।

৯. অন্য কথায় যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে খোলা মনে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে এবং ঠাণ্ডা মাথায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তার এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য যে অস্বীকৃতির পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে তা শোনে এবং কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এসব আয়াত শোনার পূর্বেই যে সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছিলো তার ওপর স্থির থাকে। প্রথম প্রকারের ব্যক্তি এই আয়াত শুনে যদিও আজ ঈমান আনছে না কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, সে কাফের থাকতে চায়। এর কারণ বরং এই যে, সে আরো নিশ্চিত হতে চায়। এ কারণে যদিও তার ঈমান আনায় বিলম্ব হচ্ছে তবুও এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে অন্য কোন আয়াত হয়তো তার মনে ধরবে এবং সে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হয়ে ঈমান আনবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তি কোন আয়াত শুনে কখনো ঈমান আনতে পারে না। কারণ, আল্লাহর আয়াতের জন্য সে আগে থেকেই তার মনের দরজা বন্ধ করে নিয়েছে। যেসব মানুষের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান তারাই সাধাণত এই অবস্থার শিকার হয়। এক, তারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তাই সত্য ও সততা তাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। দুই, তারা দুষ্কৃতকারী হয়ে থাকে। তাই তাদের পক্ষে এমন কোন শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা মেনে নেয়া অত্যন্ত কঠিন হয় যা তাদের ওপর নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। তিন, তারা এই অহংকারে আত্মমগ্ন থাকে যে, তারা সব কিছুই জানে কাজেই তাদেরকে আবার কে কি শিখাবে। এ কারণে তাদেরকে আল্লাহর যেসব আয়াত শুনানো হয় তারা তা আদৌ ভেবে চিন্তে দেখার মত কোন জিনিস বলে মনে করে না এবং তাদের শোনা ও না শোনার ফলাফল একই হয়ে থাকে।

১০. অর্থাৎ ঐ একটি আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করাই যথেষ্ট মনে করে না, সব আয়াত নিয়েই বিদ্রূপ করতে শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন সে শোনে যে কুরআনে অমুক কথা বলা হয়েছে তখন তার সোজা অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রথমে তার মধ্যেই কোন বাঁকা অর্থ অনুসন্ধান করে নেয়, যাতে তাকে বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানাতে পারে। অতপর তা নিয়ে বিদ্রূপ করার পরে বলে, জনাব, তার কথা কি বলেন, সে তো প্রতিদিন একেকটি অদ্ভুত কথা শুনাচ্ছে। দেখুন, অমুক আয়াতে সে এই মজার কথাটা বলেছে এবং অমুক আয়াতের মজার বিষয়ের তো কোন জুড়িই নেই।

১১. মূল আয়াতে আছে مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ । আরবী ভাষায় وَرَاءٌ শব্দটি এমন প্রতিটি জিনিস বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা সামনে থাক বা পেছনে থাক মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। সুতরাং এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "তাদের পেছনে রয়েছে জাহান্নাম।" যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিশ্চিন্তে দ্বিধাহীন চিত্তে এ পথে ছুটে চলেছে, অথচ সামনেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে সে অনুভূতি তাদের নেই। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা আখেরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾ قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَیْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۵﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ সেখানে চলে[১৩] আর তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে[১৪] এবং কৃতজ্ঞ হতে পার। তিনি যমীন ও আসমানের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন,[১৫] সবই নিজের পক্ষ থেকে।[১৬] এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।[১৭]

হে নবী, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দাও, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কঠিন দিন আসার আশংকা করে না[১৮] তাদের আচরণ সমূহ যেন ক্ষমা করে দেয় যাতে আল্লাহ নিজেই একটি গোষ্ঠীকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন।[১৯] যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। সবাইকে তো তার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নিজেদের এই দুষ্কর্মের মধ্যে ডুবে আছে। কিন্তু জাহান্নাম তাদের অনুসরণ করছে তা তারা জানে না।

১২. এখানে ولى শব্দ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, সেই সব দেব-দেবী এবং জীবিত বা মৃত নেতাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে যাদের সম্বন্ধে মুশরিকরা ধরে নিয়েছে, যে ব্যক্তিই তাদের নৈকট্য লাভ করেছে সে পৃথিবীতে যাই করুক না কেন আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা, তাদের হস্তক্ষেপ তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। দুই, সেই সব নেতা, আমীর-উমরাহ ও শাসকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যাদেরকে পথপ্রদর্শক ও অনুসরণীয় বানিয়ে থাকে, অন্ধভাবে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট

করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এ আয়াত এসব লোককে এ মর্মে সাবধান করে যে, এই আচরণ ও ভূমিকার ফলে যখন তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন এই দুই শ্রেণীর নেতাদের কেউই তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শূরার ব্যাখ্যা, টীকা ৬)।

১৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাঈল, টীকা ৮৩, আর রূম; টীকা ৬৯; লোকমান, টীকা ৫৫, আল মু'মিন, টীকা ১১০, আশ শূরা, টীকা ৫৪।

১৪. অর্থাৎ সমুদ্র পথে বাণিজ্য, মৎস্য শিকার, ডুবুরীর কাজ, জাহাজ চালনা এবং অন্যান্য উপায়ে রিযিক অর্জনের চেষ্টা করো।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম, টীকা–৪৪, লোকমান, টীকা ৩৫।

১৬. এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই দান দুনিয়ার বাদশাহদের দানের মত নয়। কেননা, তারা প্রজার নিকট থেকে নেয়া সম্পদ প্রজাদেরই কিছু লোককে দান করে থাকে। বিশ্ব জাহানের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর নিজের সৃষ্টি। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এসব নিয়ামত সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন কেউ আল্লাহর শরীক নয়, তেমনি মানুষের জন্য এগুলোকে অনুগত করার ব্যাপারেও অন্য কোন সত্তার কোন প্রকার দখল বা কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহ একাই এ সবের স্রষ্টা এবং তিনিই নিজের পক্ষ থেকে তা মানুষকে দান করেছেন।

১৭. অর্থাৎ অনুগতকরণে এবং এসব জিনিসকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বানানোর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন পরিষ্কারভাবে এ সত্যের প্রতি ইংগিত দান করছে যে, পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্ব জাহানের সমস্ত বস্তু এবং শক্তির স্রষ্টা, মালিক, প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ, যিনি সব কিছুকেই একটি নিয়ম–বিধির অনুগত করে রেখেছেন এবং সেই আল্লাহই মানুষের রব–যিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কৌশল এবং রহমতে এসব বস্তু ও শক্তিসমূহকে মানুষের জীবন, জীবিকা, আয়েশ–আরাম, উন্নতি ও তাহযীব–তমদ্দুনের উপযোগী ও সহায়ক বানিয়েছেন এবং একা তিনিই মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। অন্য সত্তাসমূহ এসব বস্তু ও শক্তি সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই কিংবা এসব বস্তু ও শক্তি মানুষের অনুগত করা ও কল্যাণকর বানানোর ক্ষেত্রে যাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, মানুষের দাসত্ব, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও তাদের নেই।

১৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اَلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ । এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "যেসব মানুষ আল্লাহর দিনসমূহের আশা রাখে না।" কিন্তু আরবী বাক রীতিতে এ রকম ক্ষেত্রে اَيَّام অর্থ শুধু দিন নয়, বরং এমন সব স্মরণীয় দিন যখন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে। যেমন اَيَّامُ الْعَرَبِ শব্দ আরব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং আরব গোত্রসমূহের এমন সব বড় বড় যুদ্ধ–বিগ্রহ বুঝানোর জন্য বলা হয় যা পরবর্তী বংশধররা শত শত বছর ধরে স্মরণ করে আসছে। এখানে اَيَّامُ اللّٰهِ অর্থ কোন জাতির জীবনের সর্বাধিক অকল্যাণকর দিন, যেদিন তাদের ওপর আল্লাহর গযব

নেমে আসে এবং নিজ কৃতকর্মের পরিণামে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এই অর্থ অনুসারে আমরা এই আয়াতাংশের অনুবাদ করেছি, 'যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়াবহ দিন আসার আশংকা করে না।" অর্থাৎ যাদের এ চিন্তা নেই যে, কখনো এমন দিনও আসতে পারে যখন আমাদের এসব কাজ-কর্মের ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। এই উদাসীনতাই তাদেরকে জুলুম-অত্যাচারের ব্যাপারে দুঃসাহস যুগিয়েছে।

১৯. মুফাসসিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। আয়াতের শব্দাবলী থেকে এ দুটি অর্থ গ্রহণেরই অবকাশ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনদেরকে এ জালেম গোষ্ঠীর অত্যাচার উপেক্ষা করতে হবে যাতে আল্লাহ তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতা এবং শিষ্টাচারের প্রতিদান দেন এবং তারা আল্লাহর পথে যে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছে তার পুরস্কার দান করেন।

আরেকটি অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যেন, এই গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে যাতে আল্লাহ নিজেই তাদের অত্যাচারের প্রতিফল দান করেন।

কতিপয় মুফাসসির এ আয়াতকে 'মনসূখ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন ঃ যতদিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি ততদিন এ আদেশ বহাল ছিল। কিন্তু যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পর এ হুকুম 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে। তবে আয়াতের শব্দসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনসূখ হওয়ার এ দাবী ঠিক নয়। ব্যক্তি যখন কারো জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম নয় তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া অর্থে এই 'মাফ' শব্দটি কখনো ব্যবহৃত হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে ধৈর্য, সহ্য ও বরদাশত শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ শব্দগুলো বাদ দিয়ে এখানে যখন 'মাফ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তখন আপনা থেকেই তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সেই সব লোকের জুলুম ও বাড়াবাড়ির জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া যাদেরকে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের সীমালংঘনের দুঃসাহস যুগিয়েছে। যেসব আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সাথে এ নির্দেশের কোন অমিল বা বৈপরীত্য নেই। যুদ্ধের অনুমতি দানের প্রশ্নটি এমন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যখন কোন কাফের কওমের বিরুদ্ধে যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুসলিম সরকারের কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আর ক্ষমার নির্দেশ এমন সাধারণ পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন কোন না কোনভাবে মু'মিনদের সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় এমন সব লোকদের এবং তারা তাদের বক্তব্য, লেখনী ও আচার-আচরণ দ্বারা মু'মিনদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন তাদের উচ্চতর আসন থেকে নেমে এসব হীন চরিত্র লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়তে এবং তাদের প্রতিটি অর্থহীন কাজের জবাব দিতে শুরু না করে। যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্টতা ও যৌক্তিতার সাহায্যে কোন অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দেয়া কিংবা কোন জুলুমের প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু যখনই এ সীমা লংঘিত হবে তখনই সেখানেই ক্ষান্তি দিয়ে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে। মুসলমানরা নিজেরাই যদি তাদের মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদের সাথে মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন। কিন্তু তারা যদি ক্ষমা ও

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا
اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى
شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

ইতিপূর্বে আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, হুকুম[২০] ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। আমি তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছিলাম[২১] এবং দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট হিদায়াত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো তা (অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং) জ্ঞান আসার পরে হয়েছিলো এবং এ কারণে হয়েছিলো যে, তারা একে অপরের ওপর জুলুম করতে চাচ্ছিলো।[২২] তারা যেসব ব্যাপারে মতভেদ করে আসছিলো আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই সব ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। অতপর হে নবী, আমি দীনের ব্যাপারে তোমাকে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরীয়ত) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।[২৩] সুতরাং তুমি তার ওপরেই চলো এবং যারা জানে না তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

উপেক্ষার নীতি অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ নিজেই জালেমদের সাথে বুঝা পড়া করবেন এবং মজলুমদেরকে তাদের ধৈর্য ও মহানুভবতার পুরস্কার দান করবেন।

২০. হুকুম অর্থ তিনটি জিনিস। এক–কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দীনের অনুভূতি। দুই–কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল। তিন–বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

২১. অর্থ এ নয় যে, চিরদিনের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর মর্যাদা দান করেছেন। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, সেই যুগে দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে এই খেদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন যে, তারা হবে আল্লাহর কিতাবের ধারক এবং আল্লাহর আনুগত্যের ঝাণ্ডাবাহী।

২২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৩০; আল ইমরান, টীকা ১৭ ও ১৮; আশ শূরা, টীকা ২২ ও ২৩।

إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

আল্লাহর মোকাবিলায় তারা তোমার কোন কাজেই আসতে পারে না।[২৪] জালেমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ। এটা সব মানুষের জন্য দূরদৃষ্টির আলো এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২৫]

যেসব[২৬] লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘণ্য।[২৭]

২৩. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে কাজের দায়িত্ব বনী ইসরাইলদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিলো এখন তার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। তারা জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও আত্মস্বার্থের জন্য দীনের মধ্যে এমন মতভেদ সৃষ্টি করে এবং পরস্পর এমন দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যার ফলে দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর যোগ্যতাই হারিয়ে বসে। বর্তমানে তোমাদের সেই দীনের সুস্পষ্ট রাজপথের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা সেই খেদমত আঞ্জাম দিতে পার যা বনী ইসরাঈলরা পরিত্যাগ করেছে এবং যার যোগ্যতাও তাদের ছিল না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা আশ শূরা, আয়াত ১৩ থেকে ১৫ এবং টীকা ২০ থেকে ২৬)।

২৪. অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের মধ্যে কোন প্রকার রদবদল করো তাহলে তারা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

২৫. অর্থাৎ এই কিতাব এবং এই শরীয়ত পৃথিবীর মানুষের জন্য এমন এক আলো যা হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কিন্তু তা থেকে হিদায়াত লাভ করে কেবল সেই সব লোক যারা তার সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর তা রহমত কেবল তাদের জন্যই।

২৬. তাওহীদের দিকে আহবান জানানোর পর এখান থেকে আখেরাত সম্পর্কে বক্তব্য শুরু হচ্ছে।

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً ۭ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۭ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ আসমান ও যমীনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন[২৮] এবং এ জন্য করেছেন যাতে প্রত্যেক প্রাণসত্তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।[২৯]

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে[৩০] আর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও[৩১] আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন, তার দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে আবরণ সৃষ্টি করেছেন।[৩২] আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হিদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করো না?[৩৩]

এরা বলে ঃ জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোন জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে।[৩৪]

২৭. আখেরাত সত্য হওয়ার সপক্ষে এটা নৈতিক যুক্তি-প্রমাণ। নৈতিক চরিত্রের ভাল-মন্দ এবং কর্মের মধ্যে সৎ ও অসতের পার্থক্যের অনিবার্য দাবী হলো ভাল এবং মন্দ লোকের পরিণাম এক হবে না বরং এ ক্ষেত্রে সৎ লোক তার সৎ কাজের ভাল প্রতিদান লাভ করবে এবং অসৎ লোক তার অসৎ কাজের মন্দ ফল লাভ করবে। তা যদি না হয় এবং ভাল ও মন্দের ফলাফল যদি একই রকম হয় সে ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের ভাল ও মন্দের পার্থক্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বে-ইনসাফীর অভিযোগ আরোপতি হয়। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ের পথে চলে তারা তো অবশ্যই চাইবে যেন কোন

প্রকার প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে। কারণ, এই ধারণাই তাদের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর যুক্তিপূর্ণ বিধান ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে এটা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর মানুষের সাথে একই রকম আচরণ করবেন এবং সৎকর্মশীল ঈমানদার ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে কিভাবে জীবন যাপন করেছে আর কাফের ও ফাসেক ব্যক্তিরা কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার কিছুই দেখবেন না। এক ব্যক্তি সারা জীবন নিজেকে নৈতিকতার বিধি–বন্ধনে আবদ্ধ রাখলো, প্রাপকদের প্রাপ্য অধিকার দিল, অবৈধ স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলো এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য নানা রকম ক্ষতি বরদাশত করলো। আরেক ব্যক্তি সম্ভাব্য সব উপায়ে প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা পূরণ করলো। সে না আল্লাহর অধিকার চিনলো, না বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত হলো এবং স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ যেভাবে সম্ভব দুই হাতে আহরণ করলো। আল্লাহ এই দুই শ্রেণীর মানুষের জীবনের এই পার্থক্য উপেক্ষা করবেন তা কি আশা করা যায়? মৃত্যু পর্যন্ত যাদের জীবন এক রকম হলো না, মৃত্যুর পর তাদের পরিণাম যদি একই রকম হয় তাহলে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় বে–ইনসাফী আর কি হতে পারে? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ৯ ও ১০; হূদ, টীকা ১০৬; আন নাহল, টীকা ৩৫; আল হাজ্ব, টীকা ৯; আন নামল, টীকা ৮৬; আর রূম, টীকা ৬ থেকে ৮; সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৮, টীকা ৩০)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ খেল–তামাশা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেননি। বরং এটা একটা উদ্দেশ্যমুখী জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় একথা একেবারেই অকল্পনীয় যে, যারা আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা–ইখতিয়ার ও উপায়–উপকরণ সঠিক পন্থায় ব্যবহার করে ভাল কাজ করেছে এবং যারা ঐগুলোকে ভ্রান্ত পন্থায় ব্যবহার করে জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে শেষ পর্যন্ত তারা সবাই মরে মাটিতে পরিণত হবে এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন হবে না এবং সেখানে ইনসাফ মোতাবেক তাদের ভাল ও মন্দ কাজের কোন ভাল বা মন্দ ফলাফলও প্রকাশ পাবে না। যদি তাই হয় তাহলে এই বিশ্ব জাহান তো খেলোয়াড়ের খেলার বস্তু, কোন মহাজ্ঞানীর সৃষ্ট উদ্দেশ্যমুখী ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম টীকা ২৬; আন নাহল, টীকা ৬; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫ এবং আর রূম, টীকা ৬)।

২৯. পূর্বাপর আলোচনার পেক্ষাপটে এ আয়াতের পরিষ্কার অর্থ হলো, সৎ মানুষেরা যদি তাদের সৎ কাজের পুরস্কার বা প্রতিদান না পায়, জালেমদেরকে তাদের শাস্তি না দেয়া হয় এবং মজলুমরা কখনো ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তা হবে জুলুম। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যবস্থায় এ ধরনের জুলুম কখনো হতে পারে না। একইভাবে কোন সৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম পুরস্কার দেয়া হবে কিংবা কোন অসৎ মানুষকে তার প্রাপ্যের তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া হবে আল্লাহর বিচারে এ ধরনের কোন জুলুমও হতে পারে না।

৩০. প্রবৃত্তির কামনা–বাসনাকে খোদা বানিয়ে নেয়ার অর্থ ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা আকাংখার দাস হয়ে যাওয়া। তার মন যা চায় তাই সে করে বসে যদিও আল্লাহ তা হারাম

করেছেন এবং তার মন যা চায় না তা সে করে না যদিও আল্লাহ তা ফরয করে দিয়েছেন। ব্যক্তি যখন এভাবে কারো আনুগত্য করতে থাকে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তার উপাস্য আল্লাহ নয়, বরং সে এভাবে যার আনুগত্য করছে সে-ই তার উপাস্য। সে মুখে তাকে 'ইলাহ' এবং উপাস্য বলুক বা না বলুক কিংবা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করুক বা না করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, দ্বিধাহীন আনুগত্যই তার উপাস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে কার্যত শিরক করার পর কোন ব্যক্তি শুধু এই কারণে শিরকের অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারে না যে, সে যার আনুগত্য করছে মুখে তাকে উপাস্য বলেনি এবং সিজদাও করেনি। অন্যান্য বড় বড় মুফাসসিরও আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে, সে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। প্রবৃত্তি যা কামনা করেছে সে তাই করে বসেছে। না সে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম বলে মনে করেছে, না তার হালালকৃত বস্তুকে হালাল বলে গণ্য করেছে।" আবু বকর জাসসাস এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, কেউ যেমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে সে ঠিক তেমনিভাবে প্রবৃত্তি আকাংখার আনুগত্য করে।" যামাখশারী এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রতি অত্যন্ত অনুগত। তার প্রবৃত্তি তাকে যেদিকে আহবান জানায় সে সেদিকেই চলে যায়। সে এমনভাবে তার দাসত্ব করে যেমন কেউ আল্লাহর দাসত্ব করে" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল ফুরকান, টীকা ৫৬; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; ইয়াসীন, টীকা ৫৩; আশ শূরা, টীকা ৩৮)।

৩১. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ । এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে খোদা বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন।

৩২. আল্লাহ কর্তৃক কাউকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা, তার মন ও কানের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া এবং চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করে দেয়ার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা এ গ্রন্থের কয়েকটি স্থানে করেছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১০ ও ১৬; আল আনয়াম, টীকা ১৭ ও ২৭; আল আরাফ, টীকা ৮০; আত তাওবা, টীকা ৮৯ ও ৯৩; ইউনুস, টীকা ৭১; আর রা'দ, টীকা ৪৪; ইবরাহীম, টীকা ৬, ৭ ও ৪০; আন নাহল, টীকা ১১০; বনী ইসরাঈল, টীকা ৫১; আর রূম, টীকা ৮৪; ফাতের, আয়াত ৮, টীকা ১৬ ও ১৭ এবং আল মু'মিন, টীকা ৫৪।

৩৩. যে প্রসংগে এ আয়াতটি এসেছে তাতে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে চায় প্রকৃতপক্ষে সেই সব লোকই আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতে বিশ্বাসকে নিজের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় মনে করে। তা সত্ত্বেও তারা যখন আখেরাতকে অস্বীকার করে বসে তখন তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং প্রতিনিয়তই তারা আরো বেশী করে গোমরাহীর মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকে। এমন কোন অপকর্ম থাকে না যাতে জড়িত হওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। কারো হক মারতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না। ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি তাদের

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়[৩৫] তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপদাদাদের জীবিত করে দেখাও।[৩৬] হে নবী, এদের বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান।[৩৭] তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[৩৮] কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।[৩৯]

মনে কোন শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। তাই কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ির সুযোগ লাভের পর তা থেকে তারা বিরত থাকবে এ আশা করা যায় না। যেসব ঘটনা দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেই সব ঘটনা তাদের চোখের সামনে আসে কিন্তু তারা তা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা হচ্ছে, আমরা যা কিছু করছি ঠিকই করছি এবং এসবই আমাদের করা উচিত। কোন উপদেশ বাণীই তাদের প্রভাবিত করে না। কোন মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য যে যুক্তি প্রমাণ ফলপ্রসূ হতে পারে তা তাদের আবেদন সৃষ্টি করে না। বরং তারা তাদের এই লাগামহীন স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ খুঁজে খুঁজে বের করে। ভাল চিন্তার পরিবর্তে তাদের মন ও মস্তিষ্ক রাত–দিন সম্ভাব্য সফল পন্থায় তাদের নিজেদের স্বার্থ ও কামনা–বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লেগে থাকে। আখেরাত বিশ্বাসের অস্বীকৃতি যে মানুষের নৈতিক চরিত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক এটা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। মানুষকে যদি মনুষ্যত্বের গণ্ডির মধ্যে কোন জিনিস ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তা পারে কেবল এই অনুভূতি যে, আমরা দায়িত্ব মুক্ত নই, বরং আল্লাহর সামনে আমাদের সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এই অনুভূতিহীন হওয়ার পর কেউ যদি অতি বড় জ্ঞানীও হয় তাহলেও সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ না করে পারে না।

৩৪. অর্থাৎ জ্ঞানের এমন কোন মাধ্যমই নেই যার সাহায্যে তারা জেনে নিতে পারে, এই জীবনের পরে মানুষের আর কোন জীবন নেই। তাছাড়া একথা জানতেও কোন মাধ্যম নেই যে, কোন খোদার নির্দেশে মানুষের রূহ কবজ করা হয় না, বরং শুধু কালের প্রবাহ ও বিবর্তনে মানুষ মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আখেরাত অবিশ্বাসীরা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, শুধু ধারণার ভিত্তিতে এসব কথা বলে থাকে। যদি তারা জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলে তাহলে বড় জোর বলতে পারে যে, "মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা তা আমরা জানি না।" কিন্তু একথা কখনো বলতে পারে না যে, "আমরা জানি, এই জীবনের পরে আর

কোন জীবন নেই।" অনুরূপ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানার দাবি করতে পারে না যে, মানুষের রূহ আল্লাহর হুকুমে বের করে নেয়া হয় না, বরং একটি ঘড়ি যেমন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায় তেমনি তা মরে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা বড় জোর যা কিছু বলতে পারে তা শুধু এই যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি সম্পর্কেই আমরা জানি না, প্রকৃতই কি ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবন হওয়া না হওয়া এবং রূহ কবজ হওয়া অথবা কালের প্রবাহে আপনা থেকেই মরে যাওয়ার সমান সম্ভাবনা যখন বিদ্যমান তখন এসব লোক আখেরাতের সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে যে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করছে তার কারণ তাহলে কি? প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে করে না বরং নিজেদের কামনা-বাসনার নিরিখে করে থাকে। এ ছাড়া কি এর আর কোন কারণ থাকতে পারে? যেহেতু তারা মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন চায় না এবং মৃত্যু সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বহীনতা বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া না হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ কবজ করা হোক এটাও তারা চায় না, তাই নিজেদের মনের চাহিদা অনুসারে তারা আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয় এবং এর বিপরীত জিনিসটি অস্বীকার করে বসে।

৩৫. অর্থাৎ যেসব আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার মজবুত যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আখেরাত হওয়া সরাসরি যুক্তি ও ইনসাফের দাবি। আখেরাত সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্ব ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩৬. অন্য কথায়, তাদের এই যুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যখনই কেউ তাদেরকে বলবে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন হবে তখনই তাকে কবর থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে উঠিয়ে সামনে আনতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে তারা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মৃত মানুষকে আবার কোন সময় পুনায় জীবিত করে উঠানো হবে। অথচ কেউ কখনো তাদেরকে একথা বলেনি যে, মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এই পৃথিবীতে মৃতদের জীবিত করা হবে। যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কিয়ামতের পরে আল্লাহ এক সময় যুগপৎ সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের সবার কৃতকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩৭. তারা বলতো, কালের প্রবাহ ও সময়ের বিবর্তনের আপনা থেকেই মৃত্যু আসে। এটা তাদের সেই কথার জবাব। বলা হচ্ছে, না তোমরা আকস্মিকভাবে জীবন লাভ করে থাকো, না আপনা থেকেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়। একজন আল্লাহ আছেন, যিনি তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তা কেড়ে নেন।

৩৮. তারা বলতো, আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো, এটা তারই জবাব। এতে বলা হচ্ছে, তা এখন হবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবেও হবে না। বরং সব মানুষকে একত্রিত করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট আছে।

৩৯. অর্থাৎ অজ্ঞতা এবং চিন্তা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতাই মানুষের আখেরাত অস্বীকৃতির মূল কারণ। তা না হলে প্রকৃতপক্ষে আখেরাত সংঘটিত হওয়া নয়, না হওয়াই বিবেক ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী। কোন ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে সে আপনা থেকেই অনুভব করবে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

যমীন এবং আসমানের বাদশাহী আল্লাহর।[৪০] আর যেদিন কিয়ামতের সময় এসে উপস্থিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তোমরা প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নতজানু দেখতে পাবে।[৪১] প্রত্যেক গোষ্ঠীকে এসে তার আমলনামা দেখার জন্য আহবান জানানো হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে। এটা আমাদের তৈরী করানো আমলনামা, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যাই করতে আমি তাই লিপিবদ্ধ করাতাম।[৪২]

৪০. পূর্বাপর প্রসঙ্গ সামনে রেখে বিচার করলে আপনা থেকেই এ আয়াতের যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে, যে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্ব জাহান শাসন করছেন তিনি যে মানুষদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর অসীম ক্ষমতার অসাধ্য মোটেই নয়।

৪১. অর্থাৎ সেখানে হাশরের ময়দানের এবং আল্লাহর আদালতের এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বড় বড় অহংকারীদের অহংকারও উবে যাবে। সেখানে সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতজানু হবে।

৪২. কলমের সাহায্যে কাগজের ওপর লেখানোই লিখিয়ে রাখার একমাত্র সম্ভব পদ্ধতি নয়। মানুষের কথা ও কাজ লিপিবদ্ধ করা এবং পুনরায় তা হুবহু পূর্বের মত করে উপস্থাপনের আরো কতিপয় পদ্ধতি এই পৃথিবীতে মানুষ নিজেই উদ্ভাবন করেছে। ভবিষ্যতে মানুষের করায়ত্ব হবে এরূপ আরো কি কি সম্ভাবনা আছে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কি কি পন্থায় আল্লাহ মানুষের এক একটি কথা, তার তৎপরতার প্রতিটি জিনিস এবং তার নিয়ত, ইচ্ছা, কামনা–বাসনা ও ধ্যান–ধারণার প্রতিটি গোপন থেকে গোপনতার বিষয় লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং কিভাবে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতির গোটা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড অবিকল তার সামনে পেশ করবেন তা কার পক্ষে জানা সম্ভব?

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

যারা ঈমান এনেছিলো এবং সৎকাজ করেছিলো তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। এটা সুস্পষ্ট সাফল্য। আর যারা কুফরী করেছিলো তাদের বলা হবে আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে শুনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে[৪৩] এবং অপরাধী হয়ে গিয়েছিলে। আর যখন বলা হতো, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা কিছুটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই।[৪৪]

৪৩. অর্থাৎ অহংকার বশতঃ তোমরা মনে করেছিলে আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিয়ে অনুগত হয়ে যাওয়া তোমাদের মর্যাদার পরিপন্থী এবং তোমাদের মর্যাদা দাসত্বের মর্যাদার অনেক ওপরে।

৪৪. ইতিপূর্বে ২৪ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল খোলাখুলি ও অকাট্য রূপে আখেরাত অস্বীকারকারী। কিন্তু এখানে যাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না, শুধু একটা ধারণা পোষণ করে এবং এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে না। বাহ্যত এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, একটি গোষ্ঠী আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং অপরটি তা সম্ভব বলে ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ফলাফল ও পরিণামের দিক দিয়ে এদের মধ্যে কান পার্থক্য নেই। কেননা, আখেরাত অস্বীকৃতি এবং তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার নৈতিক ফলাফল প্রায় পুরোপুরি এক। কোন ব্যক্তি, যে আখেরাত মানে না বা বিশ্বাস করে না উভয় অবস্থায় অনিবার্যরূপে তার মধ্যে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি থাকবে না এবং এই অনুভূতিহীনতা অবশ্য তাকে চিন্তা ও কর্মের গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। কেবলমাত্র আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা আচার–আচরণ ঠিক রাখতে পারে। এই বিশ্বাস না থাকলে সন্দেহ–সংশয় ও অস্বীকৃতি এ দুটি জিনিস তাকে এক প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ ও তৎপরতার দিকে ঠেলে দেয়। এই দায়িত্বহীন আচরণ ও

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿৩৩﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿৩৪﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿৩৫﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৩৬﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿৩৭﴾

সেই সময় তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে।[৪৫] তারা সেই জিনিসের পাল্লায় পড়ে যাবে যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করতো। তাদের বলে দেয়া হবে, আজ আমিও ঠিক তেমনি তোমাদের ভুলে যাচ্ছি যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎ ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন দোযখ এবং তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই। তোমাদের এই পরিণাম এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের ধোকায় ফেলে দিয়েছিলো। তাই আজ এদেরকে দোযখ থেকেও বের করা হবে না কিংবা একথাও বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো।[৪৬]

কাজেই সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি যমীন ও আসমানের মালিক এবং গোটা বিশ্ব জাহানের সবার পালনকর্তা। যমীন ও আসমানে তারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

তৎপরতাই যেহেতু আখেরাতে মন্দ পরিণামের মূল কারণ তাই না অস্বীকারকারী দোযখ থেকে রক্ষা পাবে, না সন্দেহ পোষণকারী।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেসব নিয়ম-পদ্ধতি, আচার-আচরণ এবং কাজ-কর্ম ও তৎপরতাকে তারা খুব ভাল বলে মনে করতো তা যে ভাল ছিল না সেখানে তারা তা জানতে পারবে। নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে যে মৌলিক ভুল তারা করেছে, যার

কারণে তাদের জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে তারা সেখানে তা উপলব্ধি করতে পারবে।

৪৬. এই শেষ বাক্যাংশের ধরন এরূপ যেন কোন মনিব তার কিছু সংখ্যক খাদেমকে তিরস্কার করার পর অন্যদের উদ্দেশ করে বলছেন, ঠিক আছে, এখন এই অপদার্থগুলোকে এই শাস্তি দাও।